ইউনিট ১৬

উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব - ২

ভূমিকা

যৌন জননে সক্ষম প্রতিটা উদ্ভিদের উৎপত্তি বীজ থেকে। আর এ বীজ উৎপন্ন হয় পরাগায়নের পর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে। নিষেক ক্রিয়ার পর ডিম্বাশয় পরিবর্তিত ও পরিস্ফুটিত হয়ে ফলে পরিণত হয়। আর নিষিক্ত ডিম্বক পরিবর্তিত ও পরিস্ফুট হয়ে বীজে পরিণত হয়। বীজ বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে চারিদিকে বিস্তার লাভ করে এবং এভাবে উদ্ভিদের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বিস্তরণ ঘটে। কিন্তু বীজ কেবল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেই উদ্ভিদের বংশ বিস্তার হবে না, সেগুলো যথাযথভাবে অঙ্কুরিত হয়ে চারা গাছে পরিণত হওয়া প্রয়োজন। বীজের অঙ্কুরোদগম একটি জটিল জৈবিক প্রক্রিয়া। এছাড়া যৌনজননে অক্ষম উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে অঙ্গজ উপায়ে বা অযৌন উপায়ে।

পাঠ ১৬.১

বীজ ও বীজের অঙ্কুরোদগম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বীজ কি বলতে পারবেন;
- একটি আদর্শ বীজের অংশগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- অঙ্কুরোদগমের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন;
- অঙ্কুরোদগমের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন;
- অঙ্কুরোদগমের শর্তাবলি পরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করতে পারবেন;
- অঙ্কুরোদগম না হবার কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

বীজ

পরাগায়নের পর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে বীজের উৎপত্তি ঘটে। পরিবর্তিত ও পরিপুষ্ট নিষিক্ত ডিম্বকই বীজ। প্রতিটি বীজের অভ্যন্তরে ভ্রূণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বীজের আকার, প্রকার ও বর্ণ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

বীজের অপেক্ষাকৃত শক্ত বীজাবরণ থাকে ও চলতি ভাষায় একে বীজের খোসা (seed coat) বলা হয়। বীজাবরণের দুটি স্তর থাকে। বাহিরের শক্ত স্তরকে বীজ বহিঃত্বক এবং ভিতরের পাতলা স্তরটিকে বীজ অন্তঃত্বক বলে।

বীজের গঠন

প্রধানত দুটি অংশ নিয়ে একটি বীজ গঠিত। অংশ দুটি হলো- বীজত্বক ও কার্ণেল

বীজত্বক (seed coat)

বীজের বাহিরের আবরণকে বীজত্বক বলে। আসলে ডিম্বকের ত্বক পরিবর্তিত হয়ে বীজত্বকে পরিণত হয়। অধিকাংশ বীজের বীজত্বক দু'স্তরবিশিষ্ট। বাহিরের স্তরটিকে বলা হয় বীজ বহিঃত্বক এবং ভিতরের স্তরটিকে বলা হয় বীজ অন্তঃত্বক। বীজত্বকের দুটি স্তর একত্রে সংযুক্ত থাকতে পারে অথবা একটি হতে অপরটি পৃথক থাকতে পারে। বীজ বহিঃত্বকের উপর একটি দাগ থাকে, একে বীজনাভী বলে। বীজনাভীর সাহায্যে বীজ বোঁটার সাথে সংযুক্ত থাকে। বীজের বোঁটাকে ফিউনিকুলাস বলে।

বীজনাভীর নিকটে বীজত্বকে অবস্থিত সূক্ষ্ম ছিদ্রকে বীজরন্ধ্র বলা হয়। কোনো কোনো সময় বীজ বোটার সাথে লম্বালম্বিভাবে লেগে থাকে, ফলে বীজত্বকের উপর শিরার মত উঁচু অবস্থার সৃষ্টি হয়, একে র‍্যাফি (raphe) বলে। কোনো কোনো ফলে (যেমন- লিচু, *Litchi chinensis*) বীজ বহিত্বকের উপর তৃতীয় আর একটি স্তরের সৃষ্টি হয়। একে অ্যারিল (aril) বলে। আমরা লিচুর যে অংশ খাই তাহা বীজত্বকের তৃতীয় স্তর বা অ্যারিল।

বীজত্বকের কাজ : কার্ণেল তথা বীজের অভ্যন্তরীণ অংশগুলিকে সংরক্ষণ করাই বীজত্বকের কাজ।

কার্ণেল (Kernel)

বীজত্বক ছাড়া বীজের অন্যান্য সকল অংশকে একত্রে কার্ণেল বলা হয়। কার্ণেলে শুধুমাত্র একটি ভ্রূণ থাকতে পারে (যেমন-ছোলা, *Cicer arietinum*) বা ভ্রূণ ও সস্য (এন্ডোস্পার্ম) থাকতে পারে (যেমন- ধান, *Oryza sativa*) অথবা ভ্রূণ, এন্ডোস্পার্ম ও পেরিস্পার্ম থাকতে পারে (যেমন- রেড়ি, *Ricinus communis*)। পেরিস্পার্ম নিউসেলাস টিস্যু থেকে সৃষ্টি হয় এবং ভ্রূণকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকে।

১. ভ্রূণ **(Embryo) :** বীজত্বক দ্বারা আবৃত সুপ্ত শিশু উদ্ভিদকেই ভ্রূণ বলা হয়। ইহা দুটি অংশে বিভক্ত- ভ্রূণাক্ষ ও বীজপত্র

ক. **ভ্রূণাক্ষ (Axis) :** যে অক্ষের সাথে বীজপত্র সংযুক্ত থাকে তাকে ভ্রূণাক্ষ বলে। ভ্রূণাক্ষের যে স্থানে বীজপত্র সংযুক্ত থাকে সে স্থানকে পর্বাঞ্চল (nodal zone) বলে। পর্বাঞ্চলের উপরে অবস্থিত ভ্রূণাক্ষের অংশকে বীজপত্রাধিকান্ড(epicotyle) এবং পর্বাঞ্চলের নিচে অবস্থিত ভ্রূণাক্ষের অংশকে বীজপত্রাবকান্ড (hypocotyle) বলে। ভ্রূণাক্ষের অগ্রভাগকে ভ্রূণমুকুল (plumule) বলে। এটা অঙ্কুরোদগমের পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিটপে (shoot) পরিণত হয়। ভ্রূণাক্ষের নিম্নভাগকে ভ্রূণমূল (radicle) বলে। এটা অঙ্কুরোদগমের পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মূলাঞ্চল গঠন করে।

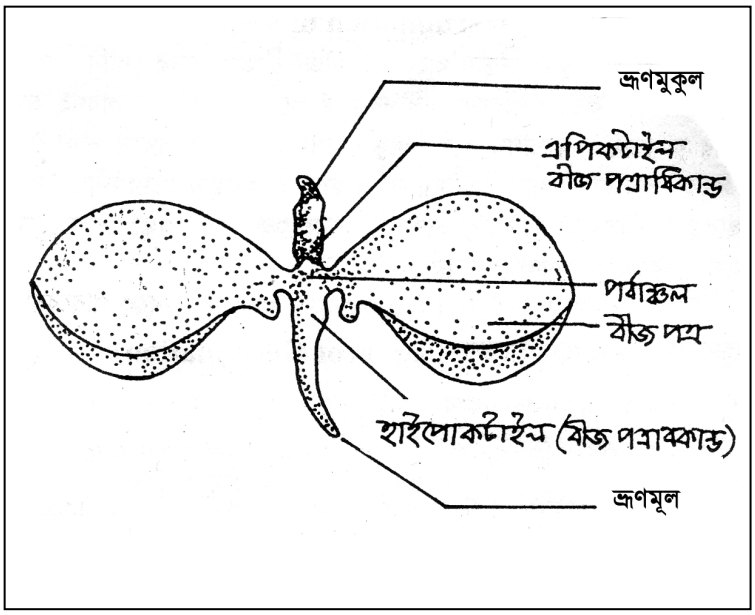

চিত্র ১৬.১-১ : একটি আদর্শ ভ্রূণের বিভিন্ন অংশ

খ. **বীজপত্র (Cotyledon) :** একবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজে একটি বীজপত্র (যেমন- ধান, গম) থাকে এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজে দুটি বীজপত্র (যেমন- আম, জাম ইত্যাদি) থাকে। বীজপত্র খাদ্য সঞ্চয় করে রাখলে রসালো হয় অন্যদিকে খাদ্য সঞ্চয় করে না রাখলে পাতলা হয়।

২. **সস্য বা শাঁস (Endosperm) :** যে টিস্যু বর্ধিষ্ণু ভ্রূণের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে তাকে সস্য বলে। সঞ্চিত খাদ্য স্টার্চ, প্রোটিন বা তেল হতে পারে। যে বীজে সস্য আছে তাকে সস্যল বীজ (endospermic বা albuminous) বলে এবং যে বীজে এন্ডোস্পার্ম নেই তাকে অসস্যল (non-endospermic বা ex-albuminous) বীজ বলে।

৩. **পেরিস্পার্ম (Perisperm) :** ডিম্বকের নিউসেলাসের অবশিষ্ট অংশকে পেরিস্পার্ম বা পরিসস্য বলা হয়। ইহা বর্ধিষ্ণু ভ্রূণ খাদ্য সরবরাহ করে। বেশিরভাগ বীজে পেরিস্পার্ম থাকে না।

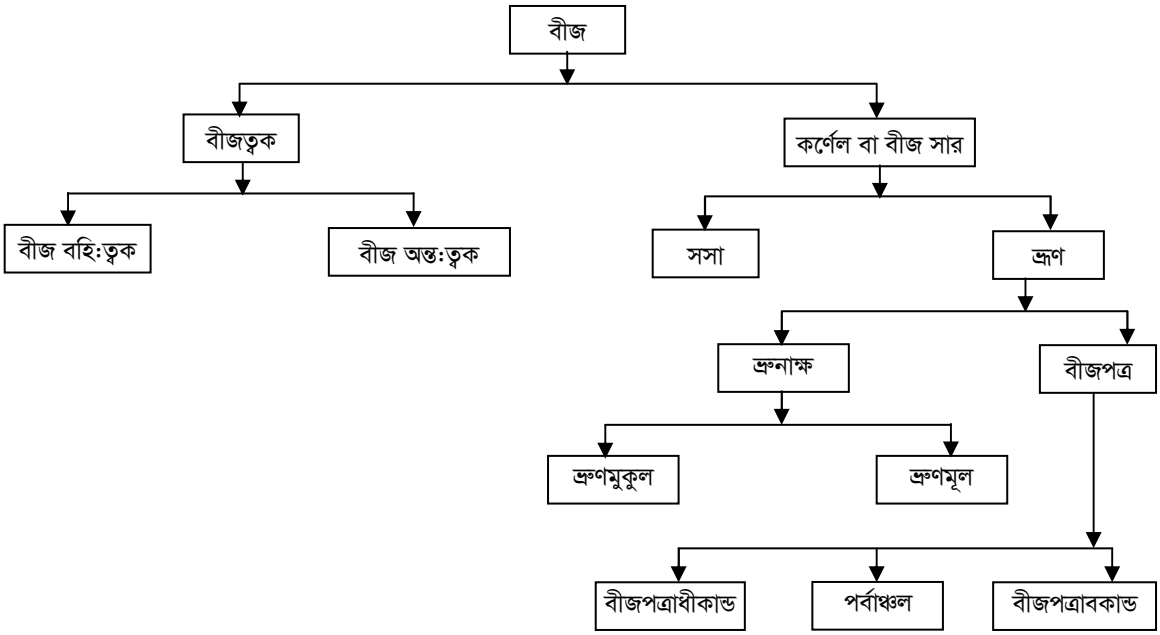

চিত্র ১৬.১-২ : একটি আদর্শ বীজ (যেমন-ধান)-এর বিভিন্ন অংশ

বীজের অঙ্কুরোদগম (Germination of seed)

বীজের মধ্যে ভ্রূণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রয়োজনীয় উপাদানের (পানি, বায়ু, তাপ ইত্যাদি) উপস্থিতিতে সুপ্ত ভ্রূণ বীজত্বক বিদীর্ণ করে অপরিণত উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। ভ্রূণের এ জাগরণই অঙ্কুরোদগম। কাজেই সুপ্তাবস্থা কাটিয়ে ভ্রূণের বৃদ্ধিকেই অঙ্কুরোগম বলে। অঙ্কুরোদগমকালে বীজ প্রথমে পানি শোষণ করে স্ফীত হয় এবং এর ফলে বীজত্বক নরম হয় ও গ্যাস বিনিময় সহজ হয়। এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় তাপ, বায়ু ও আলো পেলে বীজস্থ ভ্রূণের সুপ্তাবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ভ্রূণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অঙ্কুরোদগমকালে ভ্রূণমূল (radicle) প্রথমে বের হয়ে আসে। এরপর ভ্রূণমুকুল বের হয়।

অঙ্কুরোদগমের প্রকারভেদ (Kinds of Germination)

অঙ্কুরোদগম প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

১. মৃৎগত বা হাইপোজিয়্যাল

২. মৃৎভেদী বা এপিজিয়্যাল ও

৩. জরায়ুজ বা ভিভিপেরাস

মৃৎগত বা হাইপোজিয়্যাল (Hypozeal)

হাইপোজিয়্যাল অর্থ ভূমির নিচে (Hypo=নিচে ও geo=ভূমি বা মাটি)। এ প্রকার অঙ্কুরোদগমের সময় বীজপত্র বীজত্বকের মধ্যেই থাকে এবং কখনও ভূমি বা মাটির উপরে উঠে আসে না বরং মাটির নিচে অথবা মাটির পৃষ্ঠদেশে থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে বীজপত্রাধিকান্ড (epicotyle) অতি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলে ভ্রূণমুকুল মাটির উপরে চলে আসে এবং বীজপত্র মাটির নিচেই থেকে যায়।

যে অঙ্কুরোদগমে বীজপত্রাধিকান্ডের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ভ্রূণমুকুল মাটির উপরে চলে আসে কিন্তু বীজপত্র মাটির নিচে থেকে যায় তাকে মৃৎগত বা হাইপোজিয়্যাল অঙ্কুরোদগম বলে। যেমন- আম (*Mangifera indica*), কাঁঠাল (*Artocarpus heterophyllus*), ছোলা (*Cicer arietinum*), ধান (*Oryza sativa*), গম (*Triticum aestivum*) ইত্যাদি।

মৃৎভেদী বা এপিজিয়্যাল (Epigeal)

এপিজিয়্যাল অর্থ ভূমির উপরে (Epi=উপরে ও geo=ভূমি)। এ প্রকার অঙ্কুরোদগমের সময় বীজপত্র বীজত্বক ভেদ করে মাটির উপরে চলে আসে। এক্ষেত্রে বীজপত্রাবকান্ড (hypocotyle) অতি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলে বীজপত্র (ভ্রূণমুকুলসহ) মাটির উপরে চলে আসে। কাজেই, যে অঙ্কুরোদগমে বীজপত্রাবকান্ডের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ভ্রূণমুকুল বীজপত্রসহ মাটির উপর

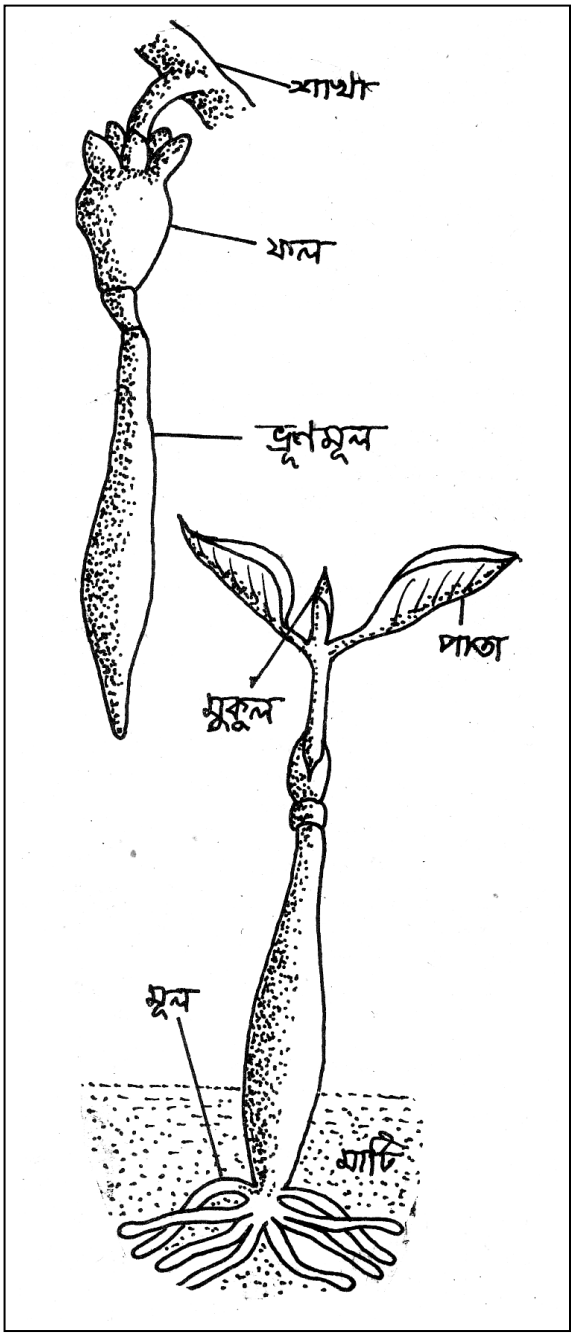

চিত্র ১৬.১-৩ : কেওড়া উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম

চলে আসে তাকে মৃৎভেদী বা এপিজিয়্যাল অঙ্কুরোদগম বলে। যেমন- শিম (*Lablab purpureus*), লাউ (*Lagenaria vulgaris*), কুমড়া (*Cucurbita maxima*) ইত্যাদি।

জরায়ুজ বা ভিভিপেরাস (Viviparous)

এ ক্ষেত্রে ফলের অভ্যন্তরে থাকা অবস্থায়ই বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে, কিন্তু ফলটি তখনও উৎপাদক গাছের সাথে সংযুক্ত থাকে। ভ্রূণমূলটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে লম্বা ও মোটা হয়। এ অবস্থায় চারাটি মূল গাছ থেকে কর্দমাক্ত মাটিতে পতিত হয় এবং মূলটি কাঁদার মধ্যে ঢুকে পড়ে। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদে (সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় জোয়ার-ভাটা এলাকার কর্দমাক্ত স্থানে জন্মানো উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে) এ ধরনের অঙ্কুরোদগম হয়ে থাকে। কেওড়া, গরান প্রভৃতি উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয়ে থাকে।

অঙ্কুরোদগমের শর্তাবলি (তথা পানি, অক্সিজেন ও তাপের প্রয়োজনীয়তা) একটি পরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণ

সুষ্ঠুভাবে অঙ্কুরোদগমের জন্য যে পরিমিত পানি, অক্সিজেন ও তাপের প্রয়োজন তা নিচের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

ছয়টি ছোলা বীজ, দুইটি বীকার বা কাঁচপাত্র, দুইটি কাঠের স্কেল, ছয়টি আলপিন, একটি রেফ্রিজারেটর।

কার্যপদ্ধতি

তিনটি ছোলাবীজকে একটি কাঠের স্কেলে তিনস্থানে তিনটি পিন দ্বারা ভালোভাবে আটকাতে হবে এবং বীজসহ কাঠের স্কেলটিকে একটি বীকারে রাখতে হবে। এখন বীকারটিতে এমন পরিমাণে পানি ঢালুন যেন মাঝখানের বীজটি আংশিক পানিতে থাকে। সুতরাং নিচের বীজটি সম্পূর্ণ পানির নিচে থাকবে এবং উপরের বীজটি মোটেই পানি পাবে না। এভাবে বীকারটিকে পরীক্ষা কক্ষে রেখে দিতে হবে।

একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বীজ ও পানি সমেত আর একটি বীকার রেফ্রিজারেটরের ভিতর রেখে দিতে হবে।

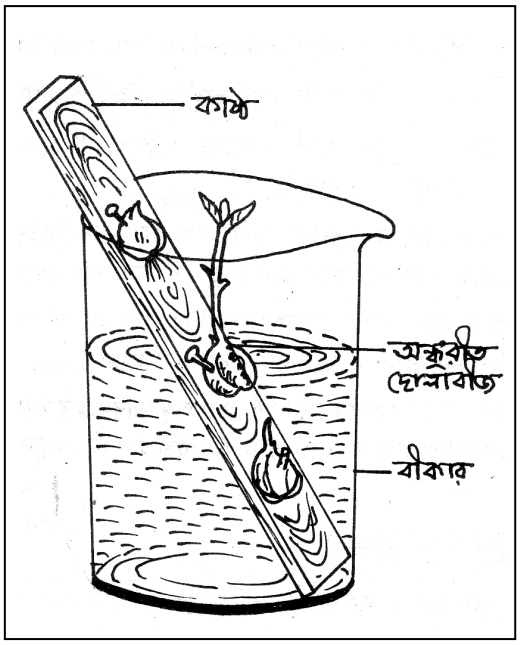

চিত্র ১৬.১-৪ : অঙ্কুরোদগমের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহের পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ

কিছুদিন পর দেখা যাবে, পরীক্ষার প্রথম সেটে সবচেয়ে উপরের বীজটির অঙ্কুরোদগম হয়নি, পানিতে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত বীজটির আংশিক অঙ্কুরোদগম হয়েছে এবং আংশিকভাবে পানিতে নিমজ্জিত বীজটি সঠিকভাবে অঙ্কুরিত হয়েছে। অন্যদিকে রেফ্রিজারেটরে রাখা পরীক্ষার দ্বিতীয় সেটের কোনো বীজেরই অঙ্কুরোদগম হয়নি, এখানে বীজ প্রয়োজনীয় তাপ পায়নি।

সিদ্ধান্ত

প্রথম সেটের উপরের বীজটি পর্যাপ্ত আলো, তাপ ও অক্সিজেন পেয়েছে কিন্তু পানি পায়নি, তাই অঙ্কুরোদগম হয়নি। কাজেই অঙ্কুরোদগমের জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয়। পানিতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত নিচের বীজটি পর্যাপ্ত পানি ও তাপ লাভ করেছে কিন্তু পরিমিত অক্সিজেন পায়নি। এজন্য আংশিক অঙ্কুরোদগম হয়েছে। অর্থাৎ সঠিক অঙ্কুরোদগমের জন্য পরিমিত অক্সিজেন প্রয়োজন। মাঝখানের পানিতে আংশিকভাবে নিমজ্জিত বীজটি পরিমিত পানি, আলো, তাপ ও অক্সিজেন লাভ করেছে, ফলে সুষ্ঠুভাবে অঙ্কুরোদগম হয়েছে।

দ্বিতীয় পরীক্ষায় মাঝখানের বীজটি পরিমিত পানি ও অক্সিজেন লাভ করেছে কিন্তু তাপ পায়নি বলে অঙ্কুরোদগম

ঘটেনি। অর্থাৎ অঙ্কুরোদগমের জন্য পরিমিত তাপেরও প্রয়োজন হয়।

সাবধানতা

বীকারে পানির উচ্চতা ঠিক রাখার জন্য মাঝে মাঝে কিছু পানি ঢালতে হবে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনারা উপর্যুক্ত পরীক্ষাটি বাড়িতে কিংবা টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে খুব সহজেই করতে পারেন। পরীক্ষাটি করুন এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে দেখান।

অঙ্কুরোদগম না হবার কারণ

সকল বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। বীজের অঙ্কুরোদগম না হবার সঙ্গে অনেকগুলো কারণ জড়িত। আমরা বীজের অঙ্কুরোদগম না হবার প্রধান কারণগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করতে পারি। যথা-

- বীজের ভ্রূণ যদি অপরিপক্ক বা অপুষ্ট থাকে।
- বীজের অঙ্কুরোগমের শর্তাবলির যে কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে
- বীজত্বক পানি প্রতিরোধী হলে।
- ফলে তথা বীজে অঙ্কুরোদগম রোধক রাসায়নিক দ্রব্য (inhibitors) থাকলে।
- শীতপ্রধান দেশ থেকে আমদানীকৃত বীজে ঠান্ডা তথা শৈত্যের প্রয়োজন হতে পারে।

বীজের ভ্রূণ অপরিণত বা অপুষ্ট হলে তা বেড়ে চারাগাছে পরিণত হতে পারে না।

অঙ্কুরোদগমের জন্য পানি, অক্সিজেন ও তাপ অধিক প্রয়োজন। এছাড়া আলো না হলে অনেক বীজের অঙ্কুরোগদম ঘটে না। যেমন- তামাক বীজ।

বীজত্বক পানি ও অক্সিজেন প্রতিরোধী হলে ভ্রূণ বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়া, যেমন- শ্বসন শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় না, ফলে বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না। যেমন- বিভিন্ন প্রকার ঘাসের বীজ।

ফলে অবস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য অনেক সময় বীজের ভ্রূণের জৈবিক প্রক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করে, ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে না। যেমন- টমেটো।

শীতপ্রধান দেশ থেকে আনা বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য ঠান্ডার প্রয়োজন হয়। ঠান্ডা না পেলে এসব বীজের জৈবিক প্রক্রিয়া শুরু হয় না, তথা বীজ অঙ্কুরিত হয় না। নগ্নবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

সারসংক্ষেপ

- পরাগায়নের পর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে বীজের উৎপত্তি ঘটে। প্রধানত দুটি অংশ নিয়ে বীজ গঠিত। যথা- বীজত্বক ও কার্ণেল।
- সুপ্তাবস্থা কাটিয়ে ভ্রূণের বৃদ্ধিকেই অঙ্কুরোদগম বলে। অঙ্কুরোদগম প্রধানত তিন প্রকার। যথা- মৃৎগত, মৃৎভেদী ও জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম।

- বীজের সুষ্ঠু অঙ্কুরোদগমের জন্য পানি, আলো, বায়ু ও তাপের প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি ছোলাবীজ অঙ্কুরোদগমের সুষ্ঠু পরিবেশ?

ক. শীতশেষের উষ্ণ মাটি　　খ. বৃষ্টিহীন বালুমাটি

গ. বায়ুপূর্ণ, উষ্ণ ও ভেজা মাটি　　ঘ. উষ্ণ ও জলাবদ্ধ মাটি

২. অঙ্কুরোদগমের জন্য শৈত্যের প্রয়োজন হয় কোন ধরনের বীজে?

ক. নগ্নবীজী উদ্ভিদের বীজে　　খ. আম বীজে

গ. তেঁতুল বীজে　　ঘ. ধান বীজে

৩. আলো প্রয়োজন হয় নিচের কোন বীজ অঙ্কুরোদগমে?

ক. পেঁয়ারা　　খ. তামাক

গ. আম　　ঘ. গম

৪. নিচের কোন উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম ঘটে?

ক. সুন্দরী উদ্ভিদে　　খ. গোলপাতা

গ. আম　　ঘ. লিচু

৫. লাউ বীজে কোন ধরনের অঙ্কুরোদগম ঘটে?

ক. মৃৎগত অঙ্কুরোদগম　　খ.জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম

গ. কোনটাই না　　ঘ.মৃৎভেদী অঙ্কুরোদগম

পাঠ ১৬.২

উদ্ভিদের অঙ্গজ জনন

উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি-

- উদ্ভিদের জনন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- জননের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন;
- জননের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন;
- অঙ্গজ জনন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারেন।

জনন (Reproduction)

জনন হল জীব জগতের অন্যতম একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। জীবের জীবন ধারণের জন্য নানা প্রকার জীবন-প্রক্রিয়া বিদ্যমান। এ সকল জীবন-প্রক্রিয়াগুলি জীবের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। তবে জনন প্রক্রিয়াটি জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। কেননা জীবের জীবন সীমিত, সেহেতু জনন প্রক্রিয়া নতুন জীব সৃষ্টি করে যেমন জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি করে তেমনিভাবে জীবের বংশ রক্ষা করে। যে জটিল জৈবনিক প্রক্রিয়ায় একটি জীব তার নিজের মত আর একটি জীব সৃষ্টি করে বংশ রক্ষা করে, তাকে প্রজনন বা জনন বলে। জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি উদ্ভিদ থেকে অনুরূপ আর একটি উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

জননের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিটি জীবের জন্য জনন প্রক্রিয়া অপরিহার্য। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

- জননের মাধ্যমে জীব তার বংশগতি রক্ষা করে।
- এ প্রক্রিয়ায় জীব তার প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে।
- পৃথিবীতে জীবজগতের ভারসাম্য রক্ষার্থে জনন প্রক্রিয়া অপরিহার্য।
- জীবের অভিব্যক্তিতে (evolution) জনন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- জনন প্রক্রিয়া না থাকলে কোনো জীবের মৃত্যুর সাথে সাথে তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যেত।

জননের প্রকারভেদ

বীজ থেকে নতুন গাছ জন্মাতে পারে, তাছাড়া গাছের কোনো অঙ্গ থেকেও নতুন গাছ জন্মাতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে জনন বিভিন্নভাবে হতে পারে। উদ্ভিদের জনন প্রক্রিয়াগুলিকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন ও যৌন জনন

অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction)

উদ্ভিদের যৌন জনন অঙ্গ (যেমন- ফুল ও বিশেষ জনন অঙ্গ) ছাড়াই অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নতুন উদ্ভিদের উৎপত্তি হওয়াকে অঙ্গজ জনন বলে। অঙ্গজ জননে উদ্ভিদদেহের একটি বিচ্ছিন্ন কিংবা সংলগ্ন অঙ্গ থেকে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। নতুন উদ্ভিদটি সাধারণত মাতৃ-উদ্ভিদের সমগুণাগুণ সম্পন্ন হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর সাহায্যে নতুন উদ্ভিদের কাঙ্ক্ষিখত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়।

অঙ্গজ জনন দু'ভাবে হতে পারে। যথা- স্বাভাবিক অঙ্গজ জনন ও কৃত্রিম অঙ্গজ জনন

স্বাভাবিক অঙ্গজ জনন (Natural vegetative reproduction)

নিম্নলিখিত উপায়ে স্বাভাবিক অঙ্গজ জনন ঘটে থাকে।

১. **মূলের সাহায্যে :** মূলের সাহায্যে জনন দুভাবে হয়। যথা-

ক. **সাধারণ মূলের সাহায্যে :** অনেক উদ্ভিদের মূল হতে অস্থানিক মুকুল বের হয়ে বংশবিস্তার করে থাকে। যেমন- পটল (*Trichosanthes dioica*)।

খ. **কন্দাল মূলের সাহায্যে :** এক্ষেত্রে মূলের চোখ থেকে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। যেমন- মিষ্টি আলু (*Ipomoea batatus*), ডালিয়া (*Dahlia hybrida*) প্রভৃতি।

২. **কান্ডের সাহায্যে :** কিছু কিছু উদ্ভিদের কান্ড, বিশেষ করে ভূ-নিম্নস্থ কান্ড বংশবিস্তার করে থাকে।

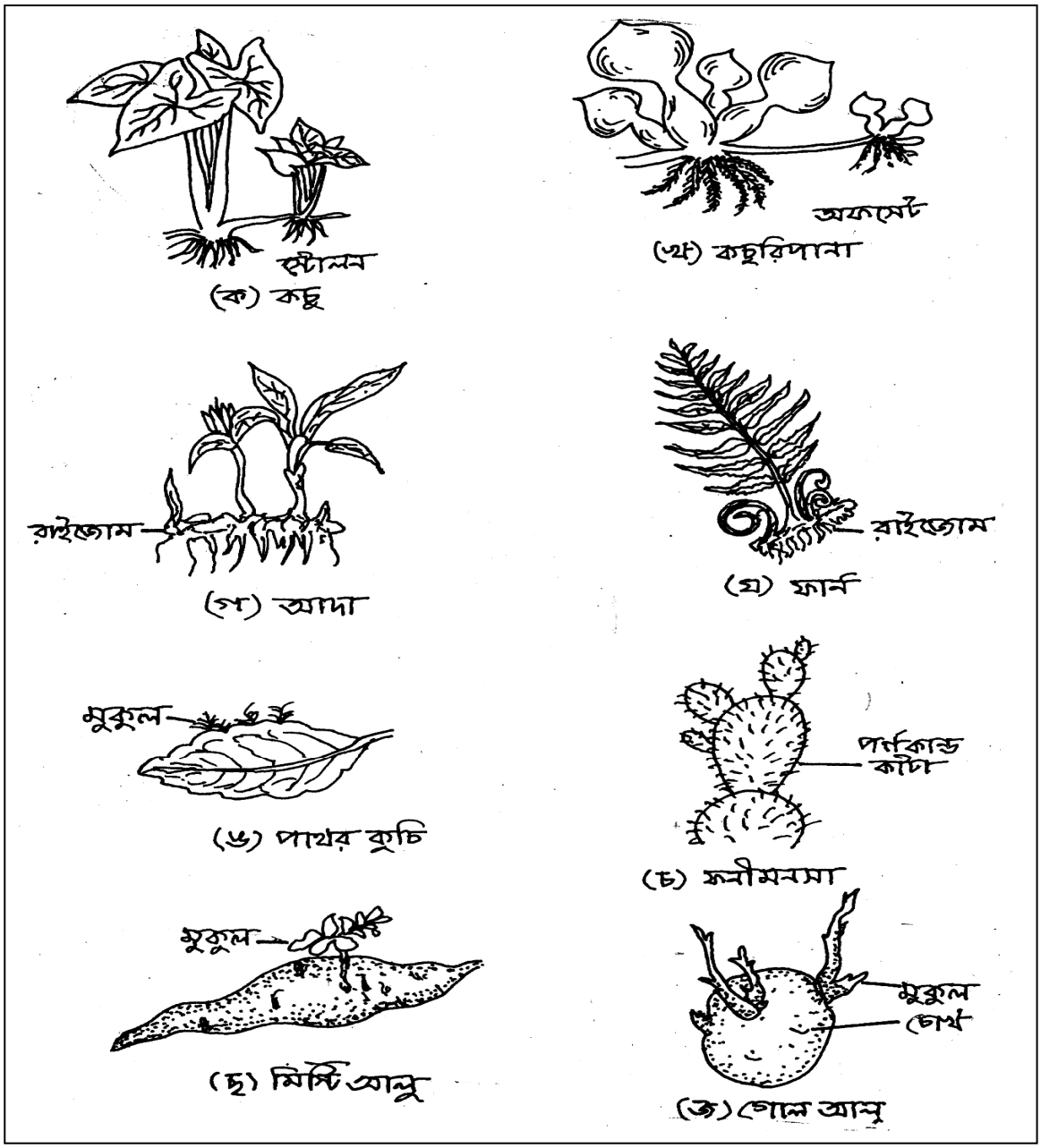

চিত্র ১৬.২-১ : বিভিন্ন ধরণের স্বাভাকি অঙ্গজ জনন

ক. **স্টোলন :** মাটির উপর সমান্তরালভাবে বিস্তৃত কান্ড বা স্টোলনের গিট বা পর্বসন্ধি থেকে নতুন গাছ জন্মে। যেমন- কচু।

খ. **রাইজোম :** মাটির নিচে সমান্তরালভাবে অবস্থিত আঁশযুক্ত কান্ডের মুকুল থেকে নতুন গাছের জন্ম হয়। যেমন- আদা, হলুদ, ফার্ণ প্রভৃতি।

গ. **পর্ণকান্ড :** কিছু উদ্ভিদের কান্ড রূপান্তরিত হয়ে পাতার কাজ করে। এসব কান্ডের অংশ থেকে নতুন গাছ জন্মে। যেমন- ফনিমনসা।

ঘ. **কন্দ :** কন্দের চোখ বা মুকুল থেকে নতুন গাছ জন্মে। যেমন- গোল আলু।

ঙ. **কন্দাল কান্ড :** কন্দের পার্শ্বীয় ও শীর্ষমুকুল থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। যেমন- পিঁয়াজ।

৩. **মুকুলের সাহায্যে :** অনেক সময় মুকুল খাদ্য সঞ্চয় করে স্ফীত ও পরিবর্তিত হয় এবং মাটিতে পড়ে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। যেমন- চুপড়ি আলু (*Dioscoria alata*)।

৪. **পাতার সাহায্যে :** কিছু কিছু উদ্ভিদের পাতা মাটিতে ফেললে পাতার কিনার থেকে অস্থানিক মুকুল বের হয়ে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। যেমন- পাথর কুচি (*Bryophyllum calycinum*), Begonia প্রভৃতি।

৫. **খন্ডিত বিখন্ডিত হয়ে :** অনেক উদ্ভিদের দেহ কোনো কারণে খন্ডিত বিখন্ডিত হয়ে গেলে তার প্রতিটা খন্ডই একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র উদ্ভিদে পরিণত হয়। যেমন- স্পাইরোগাইরা (*Spirogyra* sp.)।

৬. **অপত্য কোষ সৃষ্টি করে (By budding) :** অনেক নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ যেমন- ঈস্ট নামক এককোষী ছত্রাক এ প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে থাকে। এক্ষেত্রে মাতৃকোষ থেকে একটি শাখা বের হয়। পর্যায়ক্রমে শাখাটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে এবং মাতৃকোষ থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র নতুন কোষ তথা উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।
একটি ভালো জাতের গাছের একই গুণসম্পন্ন গাছের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য এসব প্রক্রিয়া খুবই সুবিধাজনক। তবে এ প্রক্রিয়ায় সাধারণত নতুন বৈশিষ্ট্যধারী উদ্ভিদের সৃষ্টি সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষের ক্ষেত্রে এসমস্ত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কৃত্রিম অঙ্গজ জনন (Artificial vegetative reproduction) : অর্থনৈতিক চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে দ্রুত ফল লাভের জন্য উদ্ভিদবিদরা বিভিন্ন উপায়ে উদ্ভিদের অঙ্গজ জনন ঘটিয়ে থাকেন। প্রকৃতিতে উদ্ভিদ এ প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে না। নিচে কৃত্রিম অঙ্গজ জননের কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো-

১. **শাখা কলম (Cutting) :** এ প্রক্রিয়ায় গাছের একটি শাখা কেটে নিয়ে রসালো মাটিতে রোপন করা হয়। শাখাটি স্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে নতুন গাছে পরিণত হয়। যেমন- গোলাপ, পাতাবাহার, আঁখ ইত্যাদি।

২. **কলম (Rooting or layering) :** এ ক্ষেত্রে গাছের কচি শাখার একটি অংশে কৃত্রিম পদ্ধতিতে মূল গজানো হয় এবং মূলসহ শাখাটিকে কেটে মাটিতে লাগানো হয়। যেমন- দাবা কলম, গুটি কলম ইত্যাদি। দাবা কলম

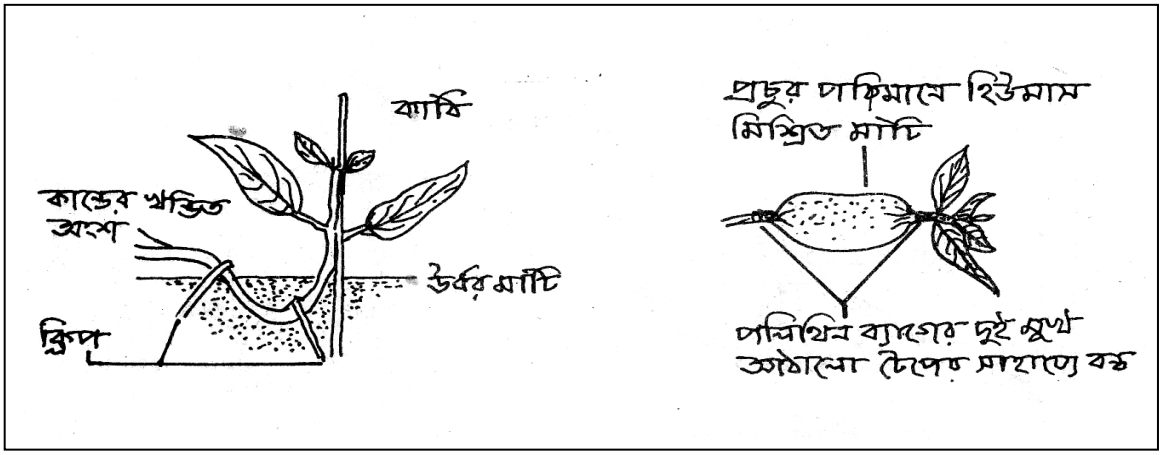

চিত্র ১৬.২-২ : দাবা কলম ও গুটি কলম

লেবু, চন্দ্রমল্লিকা, যুই, গোলাপ প্রভৃতি উদ্ভিদে করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উদ্ভিদের পরিণত কান্ডের কিছু অংশ মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়, কিছুদিন পর ঐ স্থান থেকে মূল গজাতে দেখা যায়। পরে মূলসহ ঐ অংশ কেটে অন্যত্র রোপন করা হয়। গুটি কলম আম, জাম, লেবু, লিচু প্রভৃতি উদ্ভিদে করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে গাছের কচি ডালের কিছু অংশের ছাল ছড়িয়ে ফেলে সেখানে গোবর ও মাটিসহ খড় দিয়ে বেধে পানি দেওয়া হয় এবং শেষে ঐ স্থানটি পলিথিন দ্বারা বেধে রাখা হয়। কিছুদিন পর উক্তস্থান থেকে মূল গজায় এবং মূলসহ ডালটি কেটে মাটিতে রোপন করা হয়।

৩. **জোড় কলম (Grafting) :** এ পদ্ধতিতে সাধারণত এক জাতীয় দুটি গাছের একটির কান্ডের সঙ্গে অপরটির (ভালো জাতের) শাখা কৃত্রিম উপায়ে জোড়া দিয়ে নতুন গাছ উৎপন্ন করা হয়। শাখা অংশটিকে উপজোড় বা সায়ন (Scion) এবং কান্ড অংশটিকে আদিজোড় বা রুট স্টক (root stock) বলে। এক্ষেত্রে প্রথমে রুট স্টকের মাথা ধারালো চাকু দিয়ে একটি নির্দিষ্ট আকারে কেটে (N- আকার) নিতে হয়। পরে উপজোড়ের নিচের প্রান্ত একইভাবে কেটে রুট স্টকের মাথায় ঠিকমত বসিয়ে মোম ও ছত্রাকনাশক ওষুধ লাগিয়ে সুতা দিয়ে শক্ত করে বেধে দিতে হয়। কলম সফল হলে রুট স্টক থেকে গজানো সকল শাখা ও মুকুল কেটে ফেলা হয়। লেবু, আম প্রভৃতি উদ্ভিদে এ প্রক্রিয়ায় অঙ্গজ জনন ঘটানো সম্ভব।

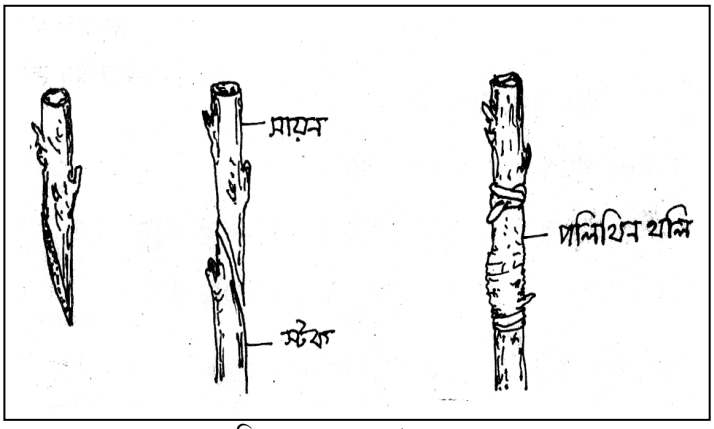

চিত্র ১৬.২-৩ : জোর কলম

৪. **চোখ কলম (Budding) :** এক্ষেত্রে এক গাছের মুকুল তুলে এনে অন্য গাছে সংযোজন করা হয়। প্রথমে যে কান্ডে (রুট স্টক) মুকুল সংযোজন করতে হবে তার বাকলে সুবিধাজনক স্থানে চাকু দিয়ে T আকারে একটা

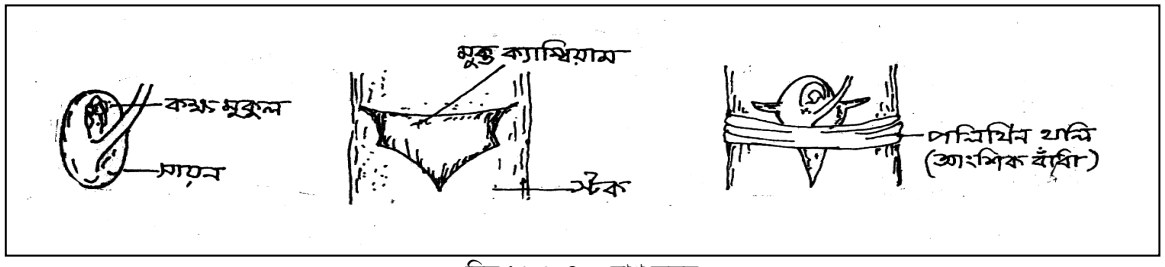

চিত্র ১৬.২-৪ : চোখ কলম

গর্ত করতে হবে। এরপর ঈস্পিত গাছ থেকে জাইলেম ও ফ্লোয়েম-এর পাতলা স্তরসহ একটি মুকুল তুলে এনে রুট স্টকের কাটা অংশে বসাতে হবে। পরে উক্ত স্থানে মোম ও ছত্রাকনাশক ওষুধ লাগিয়ে সুতা দিয়ে ভালোভাবে বাধতে হবে। মুকুলটি বড় হতে শুরু করলে রুট স্টকের উপরের অংশ কেটে ফেলতে হবে। এ মুকুল থেকে পরে নতুন গাছ সৃষ্টি হবে।

সারসংক্ষেপ

- যে জটিল জৈবনিক প্রক্রিয়ায় একটি জীব তার নিজের মত আর একটি জীব সৃষ্টি করে বংশ রক্ষা করে, তাকে প্রজনন বা জনন বলে। জননের মাধ্যমে জীব তার বংশগতি রক্ষা করে।
- জনন প্রক্রিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অঙ্গজ জনন, যৌন জনন ও অযৌন জনন।
- অঙ্গজ জনন দু'ভাবে হতে পারে স্বাভাবিক অঙ্গজ জনন ও কৃত্রিম অঙ্গজ জনন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রাকৃতিক উপায়ে উদ্ভিদের মূল, কান্ড ও পাতা থেকে নতুন উদ্ভিদ উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে বলা হয়?

ক. গুটি কলম খ. অঙ্গজ জনন গ. জোড় কলম ঘ. চোখ কলম

২. নিচের কোন উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে?

ক. আম খ. ধান গ. লেবু ঘ. পটল

৩. পর্বসন্ধি থেকে কোন উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ঘটে?

ক. কচু খ. ফণিমনসা গ. আলু ঘ. হলুদ

৪. আদার কান্ডের নাম কি?

ক. স্টোলন খ. কন্দ গ. রাইজোম ঘ. পর্ণকান্ড

৫. মুকুলের সাহায্যে কোন উদ্ভিদ বংশবৃদ্ধি করে?

ক. পটল খ. ফার্ণ গ. গম ঘ. চুপড়ি আলু

৬. নিচের কোন উদ্ভিদে শাখা কলম করা হয়?

ক. গোলাপ খ. আম গ. লিচু ঘ. কাঁঠাল

৭. পাতার সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে নিচে কোন উদ্ভিদ?

ক. আলু খ. গোলাপ গ. পাথরকুচি ঘ. লিচু।

পাঠ ১৬.৩

পরাগায়ন, নিষেক, ফল ও বীজের বিস্তারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরাগায়নের সংজ্ঞা উল্লেখ করতে পারবেন;
- পরাগায়নের প্রকারভেদ লিখতে পারবেন;
- পর-পরাগায়নের মাধ্যমগুলি আলোচনা করতে পারবেন;
- নিষেক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফল ও বীজের বিস্তারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

পরাগায়ন (Pollination)

ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু একই ফুলের অথবা একই প্রজাতির অন্য ফুলের গর্ভমুন্ডে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াকে পরাগায়ন বলা হয়।

পরাগায়ন প্রধানত দুই প্রকার। যথা- স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন।

স্ব-পরাগায়ন (self-pollination) : ফুলের পরাগধানী হতে পরাগরেণু স্থানান্তরিত হয়ে একই ফুলের গর্ভমুন্ডে অথবা একই গাছের অন্য একটি ফুলের গর্ভমুন্ডে পতিত হওয়াকে স্ব-পরাগায়ন বলে। স্ব-পরাগায়নে অংশগ্রহণকারী দুটি ফুলের জিনোটাইপ (জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী বস্তুসমষ্টি) একই রকম থাকে। প্রকৃতিতে অল্প সংখ্যক উদ্ভিদে স্ব-পরাগায়ন ঘটে। তুলা, শিম, টমেটো, কানশিরা প্রভৃতি উদ্ভিদে স্ব-পরাগায়ন পরিলক্ষিত হয়।

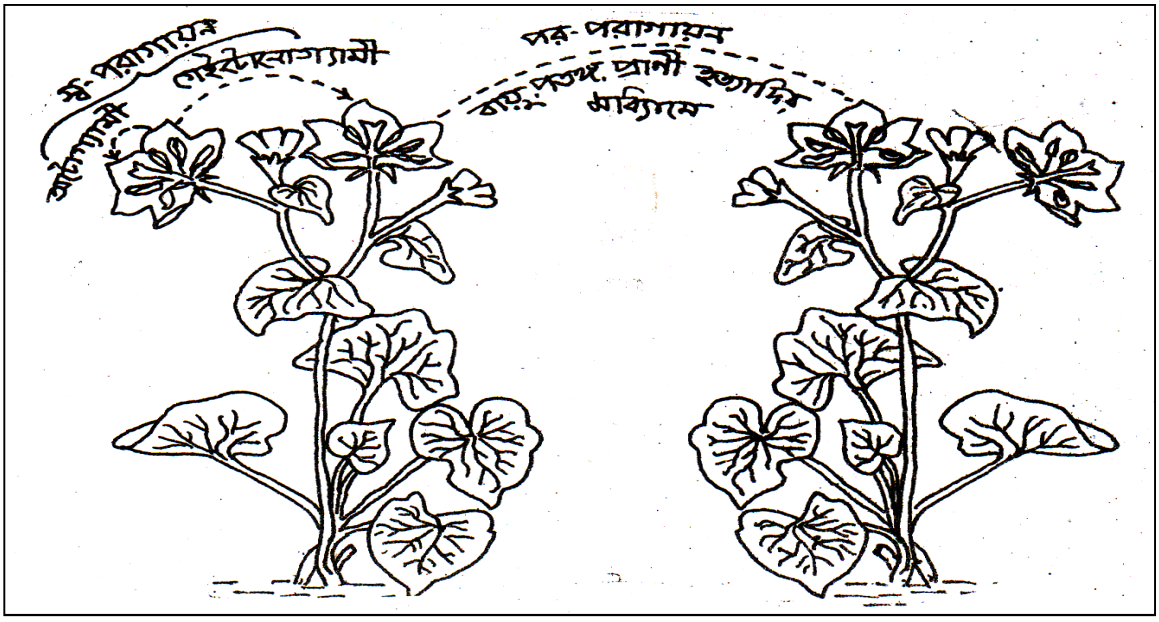

চিত্র ১৬.৩-১ : স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন

স্ব-পরাগায়নের ফলে সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদ প্রকরণে পার্থক্য খুবই কম থাকে। ফলে পরিবর্তিত পরিবেশে এ ধরনের উদ্ভিদ সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না। তবে স্ব-পরাগায়িত উদ্ভিদের ফুল ও ফল ধারণের সময় এক হওয়াতে এ ধরনের উদ্ভিদের চাষ ও শস্য আহরণে সুবিধা হয়।

পর-পরাগায়ন (cross-pollination) : একটি ফুলের পরাগধানী হতে পরাগরেণু স্থানান্তরিত হয়ে একই প্রজাতির অন্য একটি গাছের ফুলের গর্ভমুন্ডে পতিত হওয়াকে পর-পরাগায়ন বলে। পর-পরাগায়নে অংশগ্রহণকারী দুটি ফুলের জিনোটাইপ কিছুটা ভিন্নতর হয়। প্রকৃতিতে বেশিরভাগ উদ্ভিদে পর-পরাগায়ন পরিলক্ষিত হয়। ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, আম, কাঁঠাল, শিমুল ইত্যাদি উদ্ভিদে পর-পরাগায়ন ঘটে।

পর-পরাগায়নের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদে প্রকরণ দেখা যায়। যা উদ্ভিদকে পরিবর্তনশীল পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে। পর-পরাগায়নের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদ পিতৃ-মাতৃ উদ্ভিদ হতে লম্বা হতে পারে, যা খাটো উদ্ভিদ অপেক্ষা অধিক আলো পেতে সাহায্য করে। পর-পরাগায়নের ক্ষেত্রে পরাগরেণু দূরবর্তী স্থানে স্থানান্তরের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। সাধারণত পতঙ্গ, বায়ু, পানি ও প্রাণির মাধ্যমে পরাগায়ন ঘটে। পরাগায়নের মাধ্যমের ভিন্নতার জন্য পরাগায়ন প্রক্রিয়ার নাম ভিন্নতর হয়। নিম্নে বিভিন্ন মাধ্যমে পর-পরাগায়নের বর্ণনা দেওয়া হল।

পতঙ্গের সাহায্যে পরাগায়ন : অধিকাংশ উদ্ভিদের পরাগায়ন পতঙ্গের মাধ্যমে হয়। যে সকল ফুলের পরাগায়ন পতঙ্গের সাহায্যে হয়ে থাকে তাকে পতঙ্গপরাগী ফুল বলা হয় এবং এ প্রক্রিয়াকে পতঙ্গ পরাগায়ন বলে। পতঙ্গ পরাগী ফুলের উজ্জল বর্ণ, সুগন্ধ ও মধুগ্রন্থি থাকে। বর্ণ ও গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মধু সংগ্রহরে জন্য ফুলে ঢোকার সময় পতঙ্গের দেহে পরাগরেণু লেগে যায়। এ পতঙ্গ মধু সংগ্রহের জন্য যখন একই প্রজাতির অন্য ফুলে ঢোকে তখন এদের দেহে লেগে থাকা পরাগরেণু ঐ ফুলের গর্ভমুন্ডে লেগে পরাগায়ন ঘটায়। সরিষা, হাসনাহেনা, বাবলা প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে পতঙ্গ পরাগায়ন ঘটে।

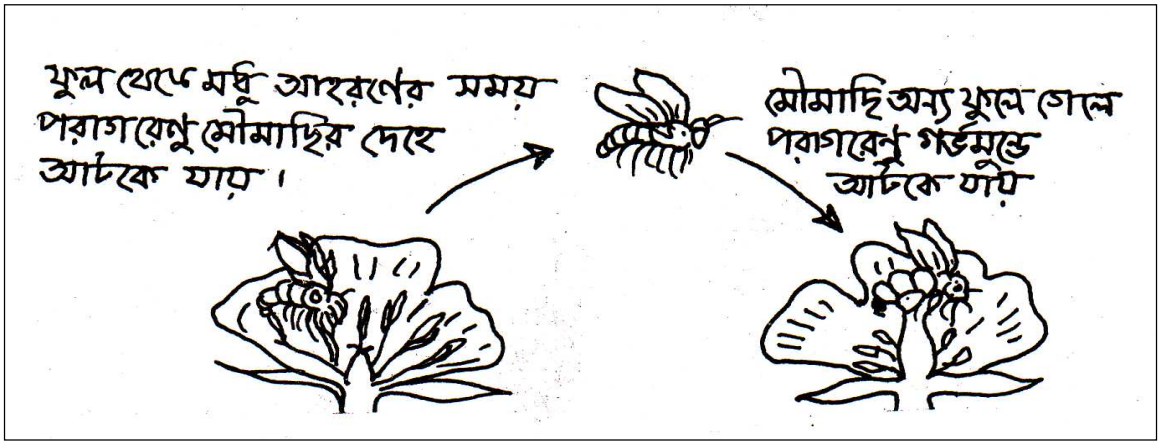

চিত্র ১৬.৩-২ : পতঙ্গ পরাগায়ন

বায়ুর সাহায্যে পরাগায়ন : অনেক উদ্ভিদের ফুলের পরাগায়ন বায়ুর সাহায্যে হয়ে থাকে। যে ফুলের পরাগায়ন বায়ুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে তাকে বায়ু পরাগী ফুল বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে বায়ু পরাগায়ন বলে। বায়ু পরাগী ফুল সাধারণত আকর্ষণহীন হয়। এ সমস্ত ফুল আকারে ছোট, ফলে এদের পরাগরেণু ক্ষুদ্র ও হালকা হয়। এদের পরাগরেণু হালকা হওয়ায় সহজেই বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে। এ জাতীয় উদ্ভিদের ফুলে অসংখ্য পরাগরেণু সৃষ্টি হয়, কেননা বায়ুর মাধ্যমে পরাগরেণু স্থানান্তরের সময় অনেক পরাগরেণু নষ্ট হয়ে যায়। বাতাসে ভেসে আসা পরাগরেণু ধরার জন্য এসকল উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুন্ড পাখির পালকের মত রোমশ হয়। পাইনাস, ধান, গম, ভূট্টা, ইক্ষু, ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে এ প্রক্রিয়ায় পরাগায়ন ঘটে।

চিত্র ১৬.৩-৩ : বায়ু পরাগায়ন

প্রাণির সাহায্যে পরাগায়ন : কিছু কিছু ফুলের পরাগায়ন পাখি, বাদুড়, শামুক, কাঠবিড়ালি প্রভৃতি প্রাণি দ্বারা হয়ে থাকে। যে সকল ফুলের পরাগায়ন প্রাণির সাহায্যে হয়ে থাকে তাকে প্রাণি

পরাগী ফুল বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রাণি পরাগায়ন। প্রাণি পরাগী ফুল সাধারণত বড় ও উজ্জ্বল বর্ণের হয়। মাদার, শিমুল, কদম প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলের পরাগায়ন প্রাণির সাহায্যে হয়ে থাকে।

পানির সাহায্যে পরাগায়ন : যে ফুলের পরাগায়ন পানির সাহায্যে হয়ে থাকে তাকে পানি পরাগী ফুল বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে পানি পরাগায়ন বলে। পাতাশেওলা, কাঁটা শেওলা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদে পানি পরাগায়ন ঘটে।

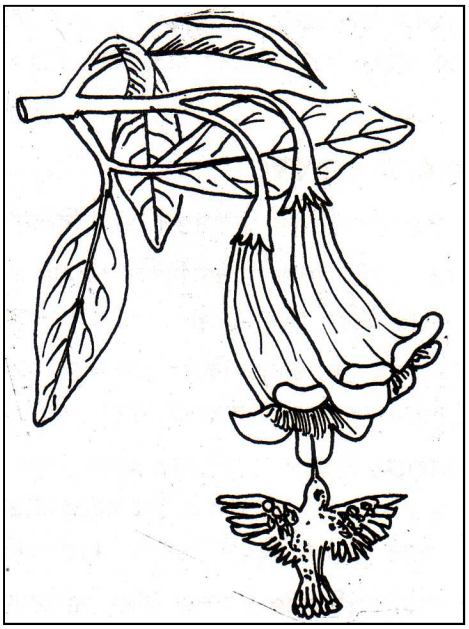

চিত্র ১৬.৩-৪ : প্রাণী পরাগায়ন

নিষেক (Fertilization)

আকার, আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্যযুক্ত একটি পুংগ্যামেট (পুংজনন কোষ) এবং একটি স্ত্রীগ্যামেট (স্ত্রীজনন কোষ)-এর মধ্যকার মিলন প্রক্রিয়াকে নিষেকক্রিয়া বা গর্ভাধান বলে। নিষেকক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন পুংগ্যামেট ও স্ত্রীগ্যামেট। ফুলের পরাগধানীর পরাগরেণু হতে পুংগ্যামেটের সৃষ্টি হয় এবং গর্ভাশয়ের ডিম্বকের অভ্যন্তরে স্ত্রীগ্যামেট বা ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয়। নিষেকক্রিয়ার ফলে 2n নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট জাইগোট সৃষ্টি হয়।

নিষেক প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত গর্ভমুন্ডে পতিত পরাগরেণু তরল পদার্থ শোষণ করে আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও অঙ্কুরিত হয়। অর্থাৎ পরাগরেণুতে পরাগনালিকার সৃষ্টি হয়। পরাগনালিকাটি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভমুন্ড হতে গর্ভদন্ডের ভিতর দিয়ে গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌছায় এবং গর্ভাশয়ের স্তর বেয়ে শেষে ডিম্বক পর্যন্ত পৌছায়। অধিকাংশ উদ্ভিদে পরাগনালিকা ডিম্বক রন্ধ্রপথে ডিম্বকে প্রবেশ করে। ডিম্বকে প্রবেশের পর পরাগনালিকা ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে শেষে ডিম্বানুর নিকট পৌছে। পরে পরাগনালিকার অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে ফেটে যায় এবং দুটি শুক্রাণুকোষ তথা পুংগ্যামেট ভ্রূণথলিতে পতিত হয়। ভ্রূণথলিতে পতিত দুটি পুংগ্যামেটের মধ্যে একটি পুংগ্যামেট ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় অর্থাৎ নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পুংগ্যামেট ও স্ত্রীগ্যামেট (ডিম্বাণু) উভয়ের ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড (n) অর্থাৎ দেহ ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক। সুতরাং এদের মিলনে যে জাইগোটের সৃষ্টি হয় তা ডিপ্লয়েড (2n)।

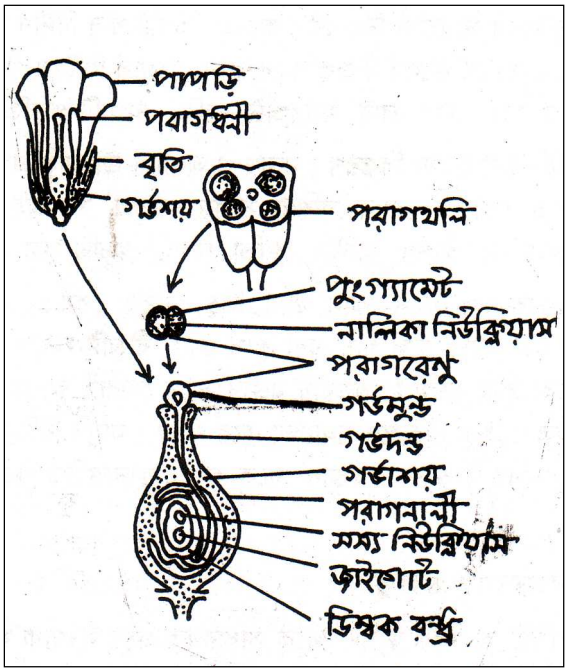

চিত্র ১৬.৩-৫ : নিষেক বা গর্ভাধান

নিষিক্ত হবার পর ফুলের গর্ভাশয়টি সাধারণত ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয়। ফল ও বীজ বিভিন্নভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে উদ্ভিদের বংশবিস্তার করে।

ফল ও বীজের বিস্তরণ

ফল ও বীজ তাদের নিজ আবাসস্থল থেকে বিভিন্ন উপায়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়াকে বিস্তার বা বিস্তরণ বলে।

সাধারণত প্রতিটি পুষ্পক উদ্ভিদ বিপুল পরিমাণ ফল ও বীজ উৎপাদন করে থাকে। এ কারণে ফল ও বীজগুলি উৎপাদনকারী উদ্ভিদ হতে বিভিন্ন উপায়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন হয়।

যে সব মাধ্যমে ফল ও বীজ বিস্তার লাভ করে তাদের নাম অনুসারে বিস্তরণ প্রক্রিয়ার নামকরণ করা হয়। ফল ও বীজের বিস্তরণের মাধ্যমগুলি হলো- বায়ু, পানি, কম্পিত স্ফুটন ও প্রাণি।

বায়ুর সাহায্যে বিস্তরণ : সাধারণত হালকা, ক্ষুদ্র ও নানা প্রকার উপাঙ্গবিশিষ্ট ফল ও বীজ বায়ুর মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ এ সমস্ত ফল ও বীজ সহজে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। শাল, মেহগনি, সজিনা, ছাতিম, সূর্যমুখী, অর্কিড প্রভৃতি উদ্ভিদের বিস্তারণ বায়ুর মাধ্যমে ঘটে।

পানির সাহায্যে বিস্তরণ : জলজ উদ্ভিদ সাধারণত পানির সাহায্যে বিস্তার লাভ করে থাকে। এছাড়া যে সকল উদ্ভিদ জলাধারের নিকটে জন্মে, তাদের বিস্তরণও পানির মাধ্যমে ঘটে। পানিতে ভাসতে পারে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এ সকল ফলে বা বীজে বর্তমান থাকে। এ সকল ফল বা বীজগুলি সাধারণত হালকা হয় এবং স্পঞ্জী টিস্যু দ্বারা আবৃত থাকে। নারিকেল, শাপলা, পদ্ম, তাল প্রভৃতি ফল পানি দ্বারা বিস্তরণ ঘটে।

স্ফুটনের সাহায্যে বিস্তরণ : অনেক বিদারী ফল বিদীর্ণ হবার সময় যে কম্পনের সৃষ্টি হয় বা শক্তি উৎপন্ন হয় তার সাহায্যে যে ফলের বীজগুলি বেশ অনেক দূরে ছিটিয়ে পড়ে। ফলটি শুষ্ক হলে, সামান্য স্পর্শ বা নাড়াতে উহা বিদীর্ণ হয়ে যায়। মাসকলাই, মটরশুটি, বেড়ি, দোপাটি প্রভৃতি ফল এ প্রক্রিয়ায় বিস্তরণ ঘটায়।

প্রাণির সাহায্যে বিস্তরণ : মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু প্রাণির অন্তর্ভুক্ত। যে সকল ফল ও বীজ জীবজন্তু দ্বারা বিস্তার লাভ করে, তা এমন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয় যে, সহজেই জীব-জন্তুর গায়ে লেগে স্থানান্তর ঘটতে পারে। যেমন- প্রেমকাঁটা, আপাং, অর্কিড, পুনর্ভবা, ঘাগড়া প্রভৃতি ফল এভাবে বিস্তরণ ঘটে।

অনেক ফল যেমন- আম, জাম, লিচু, খেঁজুর, পেয়ারা, তেঁতুল ইত্যাদি পাখিরা ভক্ষণের জন্য ঠোঁটে করে একস্থান থেকে অন্যত্র চলে যায় এবং শাঁস খেয়ে বীজটি ফেলে দেয়। এছাড়া অনেক পশুপক্ষী বীজসহ ফল খেয়ে ফেলে এবং বীজ হজম না হওয়ায় মলের সাথে বেরিয়ে আসে। এভাবে ফল ও বীজের বিস্তরণ ঘটে। মানুষ বিভিন্নভাবে ফল ও বীজ বিস্তরণে সহায়তা করে থাকে। মানুষ বিভিন্ন ফল যেমন- আম, লিচু, নারিকেল, তাল, কাঁঠাল ইত্যাদি ভক্ষণের উদ্দেশ্যে একস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে। এর দ্বারা ফল ও বীজের বিস্তরণ ঘটে।

বিস্তরণের গুরুত্ব

প্রতিটি স্বপুষ্পক উদ্ভিদ থেকে সাধারণত প্রচুর সংখ্যক ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়। এসব বীজের সফল অঙ্কুরোদগম ও বৃদ্ধির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হবার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মাটি, পানি, বায়ু, আলো ও পরিমিত জায়গা। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রজাতির বংশবৃদ্ধি ও অস্থিত্ব বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পরিবেশের জন্য ফল ও বীজের বিস্তারণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপ

- ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু একই ফুলের অথবা একই প্রজাতির অন্য ফুলের গর্ভমুন্ডে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াকে পরাগায়ন বলা হয়।
- পরাগায়ন দু'প্রকার। যথা : স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন।
- আকার, আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্যযুক্ত একটি পুংগ্যামেট (পুংজনন কোষ) এবং একটি স্ত্রীগ্যামেট (স্ত্রীজনন কোষ)-এর মধ্যকার মিলন প্রক্রিয়াকে নিষেকক্রিয়া বা গর্ভাধান বলে।
- সাধারণত বায়ু, পানি, কম্পিত স্ফুটন ও প্রাণির মাধ্যমে ফল ও বীজের বিস্তরণ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোন উদ্ভিদে স্ব-পরাগায়ন ঘটে?

ক. আম খ. শিম গ. সরিষা ঘ. ধান

২. পর-পরাগায়িত উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. একই গাছের দুটি ফুলের মাঝে পরাগায়ন ঘটে।
খ. একই গাছের একই ফুলে পয়গায়ন ঘটে।
গ. দুটি ফুলের জিনোটাইপ একই রকমের হয়।
ঘ. দুটি ফুলের জিনোটাইপ ভিন্নতর হয়।

৩. বায়ু পরাগী ফুল কোনটি?

ক. ধান খ. শিমুল গ. সরিষা ঘ. বাবলা

৪. শিমুল উদ্ভিদে কোন ধরণের পরাগায়ন ঘটে?

ক. বায়ু পরাগায়ন খ. পানি পরাগায়ন গ. প্রাণি পরাগায়ন ঘ. পতঙ্গ পরাগায়ন

৫. জাইগোটের সংখ্যা কত?

ক. n সংখ্যক খ. 2n সংখ্যক গ. 3n সংখ্যক ঘ. 4n সংখ্যক।

পাঠ ১৬.৪

উদ্ভিদের অযৌন ও যৌন জনন, অপুংজনি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

উদ্ভিদের অযৌন জনন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;

- যৌন জনন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- অপুংজনি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

অযৌন জনন (Asexual Reproduction)

কতকগুলি উদ্ভিদ বিশেষ করে অপুষ্পক উদ্ভিদ কতকগুলি বিশেষ ধরনের কোষ তথা এককোষী রেণু বা স্পোর (spore) সৃষ্টির মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে তাকে অযৌন জনন বলে। সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ (যেমন- শৈবাল, ছত্রাক, মস, ফার্ণ ইত্যাদি) স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন ঘটায়। স্পোরগুলি স্পোর থলি বা রেণুথলির (*sporangium*) মধ্যে জন্মায়। কিছু শৈবাল (যেমন- *Clamydomonas, Ulothrix, Oedogonium* ইত্যাদি) ও কিছু ছত্রাক নগ্ন ও ফ্লাজেলা বা রোমযুক্ত চলনশীল চলনরেণু বা জুস্পোর (zoospore) সৃষ্টির মাধ্যমে মূল উদ্ভিদের অনুরূপ উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। ফার্ণ (pteris) উদ্ভিদে ক্যাপসুলের মধ্যে রেণু তৈরি হয় এবং ঐ রেণু অঙ্কুরিত হয়ে প্রোথ্যালাস (গ্যামেটোফাইট) উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। পরে প্রোথ্যালাসে যৌন জনন ঘটে।

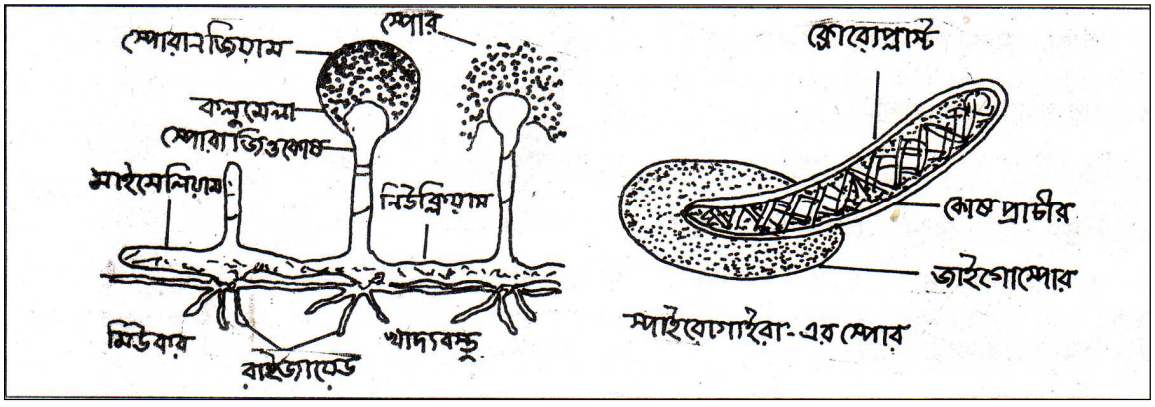

চিত্র ১৬.৪-১ : বিভিন্ন ধরনের অযৌন প্রজনন

যৌন জনন (Sexual Reproduction) :

যৌন জনন প্রক্রিয়ার একককে বলা হয় যৌন জননকোষ বা গ্যামেট (gamete)। গ্যামেট দু'ধরণের, যথা পুং গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেট। পুংগ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেটের মিলনের ফলে সংঘটিত জননকেই যৌন জনন বলা হয়। এক্ষেত্রে পুং জননকোষ ও স্ত্রী জননকোষের মিলনে জাইগোট সৃষ্টি হয়। এ জাইগোট থেকেই পরে নতুন বংশধরের আবির্ভাব ঘটে।

যৌন জনন কোষগুলি (গ্যামেট) সর্বদাই হ্যাপ্লয়েড (n) হয়। দুটি গ্যামেট মিলিত হয়ে সৃষ্ট জাইগোট (zygote) বা জাইগোস্পোর (zygospore) সর্বদাই ডিপ্লয়েড (2n) প্রকৃতির।

নিম্ন শ্রেণীর জীবে যৌন জননকালে দেহকোষ সরাসরি জননকোষধারে পরিণত হয়, কিন্তু উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদে

পৃথকভাবে দেহে যৌন জনন অঙ্গ গঠিত হয় এবং পরে এ অঙ্গ থেকে জননকোষ উৎপন্ন হয়। পুংজনন অঙ্গকে অ্যানথেরিডিয়াম (antheridium) এবং স্ত্রী জনন অঙ্গকে শৈবাল ও ছত্রাকের ক্ষেত্রে এককোষী উগোনিয়াম (oogonium), অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদে (মস, ফার্ণ ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে) বহুকোষী আর্কিগোনিয়াম (archigonium) এবং গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মেগাস্পোরাঞ্জিয়াম (ovule) বলা হয়।

উদ্ভিদের যৌনজনন প্রক্রিয়া কয়েকটি স্বতন্ত্র ধাপে সম্পন্ন হয়। যেমন-

পরাগায়ন →নিষেক→ফল ও বীজ উৎপাদন → ফল ও বীজ বিস্তরণ → বীজের অঙ্কুরোদগম।

স্বপুষ্পক উদ্ভিদের যৌনজনন ভালোভাবে বুঝতে হলে একটি সম্পূর্ণ ফুলের বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। একটি আদর্শ ফুল সাধারণত পাঁচটি অংশে বিভক্ত। যথা-পুষ্পধারক, বৃতি, দলমন্ডল, পুংস্তবক ও স্ত্রী স্তবক।

পুষ্পধারক (thalamus) : প্রতিটি ফুলের একটি বৃন্ত বা বোটা থাকে। পুষ্পবৃন্তের অপেক্ষাকৃত চওড়া ও সংক্ষিপ্ত উপরিভাগকে পুষ্পধারক বলে।

বৃতি (calyx) : ফুলের সর্বনিম্নে ও প্রথম আবর্তে কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার সবুজ বর্ণের পত্রের ন্যায় অংশ থাকে। একে বৃতি বলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা পাপড়ির ন্যায় রঙ্গিন হয়ে থাকে। বৃতি কুড়ি অবস্থায় ফুলকে রক্ষা করে।

দলমন্ডল (corolla) : ফুলের পাপড়িকে দল বলে। কয়েকটি পাপড়ি মিলে দলমন্ডল গঠিত। পরপরাগী ফুলের পাপড়িগুলো পরপরাগায়নের জন্য কীটপতঙ্গ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে উজ্জ্বল বর্ণের হয়। এদের পাদদেশে অবস্থিত মধুগ্রন্থি থেকে মধু আহরণ করতে যেয়ে কীটপতঙ্গ ফুলের পরাগায়ন ঘটায়।

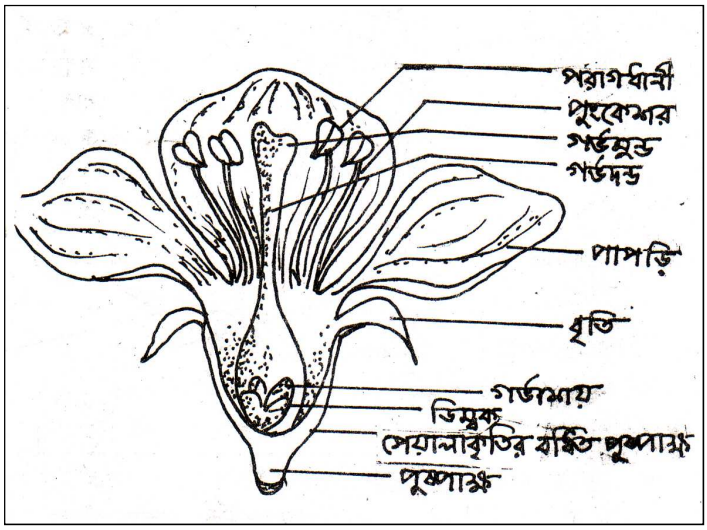

চিত্র ১৬.৪-২ : একটি আদর্শ ফুলের লম্বচ্ছেদ

পুংস্তবক (androecium) : ফুলের তৃতীয় আবর্তকেই পুংস্তবক বলে। কয়েকটি পুংকেশর নিয়ে পুংস্তবক গঠিত। পুংকেশরের মাথায় থলির মতো অংশই পরাগধানী। এতে পরাগরেণু তৈরি হয়। পরাগরেণুতে পুংনিউক্লিয়াস থাকে। পরাগধানীর নিচের দিকের সরু, লম্বা ক্ষুদ্র শলাকার ন্যায় অংশকে পরাগদন্ড বলে।

স্ত্রীস্তবক (gynoecium) : ফুলের আভ্যন্তরীণ ও উপরের চতুর্থ আবর্তকেই স্ত্রীস্তবক বলে। এক বা একাধিক স্ত্রীকেশর নিয়ে স্ত্রীস্তবক গঠিত। স্ত্রীকেশর গর্ভাশয়, গর্ভদন্ড ও গর্ভমুন্ড এ তিন অংশে বিভক্ত। গর্ভাশয়ে ডিম্বকের ভিতর স্ত্রী নিউক্লিয়াস বা ডিম্বাণু থাকে।

উদ্ভিদের প্রকরণ (Variation)

পর-পরাগায়ন প্রক্রিয়ায় ডিম্বক নিষিক্ত হাবার পর উৎপন্ন বীজে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটে। ফলে এ ধরনের বীজ থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদেও বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

পিতৃ ও মাতৃ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কিভাবে বংশ পরম্পরায় পরবর্তী উদ্ভিদগুলিতে প্রকাশ পায়, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানী গ্রেগর ইয়োহান মেন্ডেল মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং উদ্ভিদের প্রজনন সম্পর্কিত

দুটি সূত্রের উদ্ভাবন করেন।

মেন্ডেল মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষাকালে একটি লম্বা ও একটি খাটো মটর গাছ বেছে নেন। তিনি প্রথমে একটি লম্বা গাছের পরাগরেণু খাটো গাছের গর্ভমুন্ডে এবং একটি খাটো গাছের পরাগরেণু লম্বা গাছের গর্ভমুন্ডে স্থানান্তর করে এদের প্রজনন ঘটান। অন্য কোনো অবাঞ্চিত পরাগরেণু যাতে এ পরীক্ষায় কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করতে না পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেন। এ প্রজননের ফলে প্রথম জনুতে (F_1) উৎপন্ন সকল গাছ লম্বা হয়। প্রথম জনুতে উৎপন্ন গাছের মধ্যে স্বপরাগায়নের ফলে উৎপন্ন দ্বিতীয় জনুতে (F_2) লম্বা ও খাটো উভয় ধরণের গাছ পাওয়া যায়; যার মধ্যে মোট গাছের ৩ ভাগ লম্বা ও ১ ভাগ খাটো গাছ ছিল।

মেন্ডেলের পরীক্ষণের ক্ষেত্রে লম্বা গাছের জিনোটাইপ (TT) এবং খাটো গাছের জিনোটাইপ (tt) ধরা হয়।

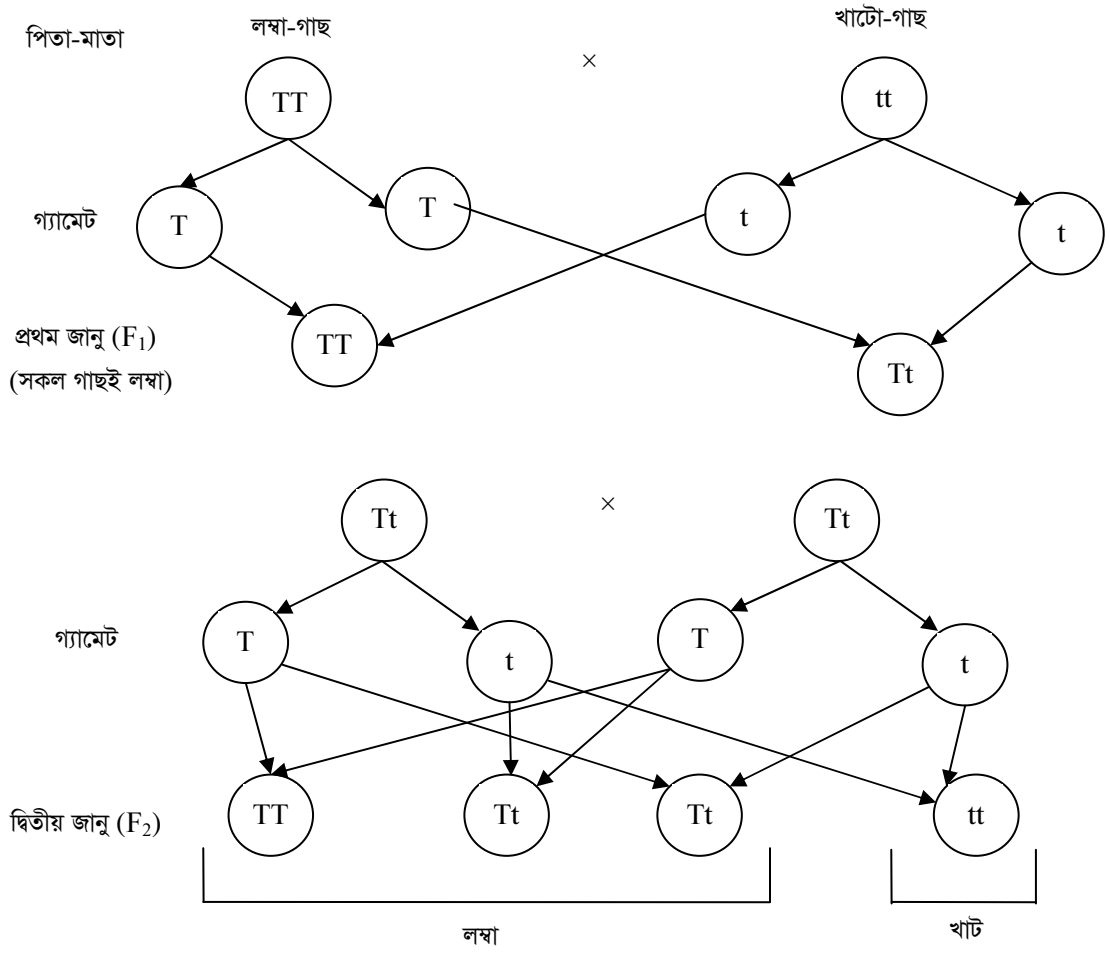

চিত্র ১৬.৪-৩ : মেন্ডেলের পরীক্ষণ

মেন্ডেলের এ সূত্র প্রয়োগ করে উদ্ভিদ ও প্রাণির সুপ্রজনন ঘটানো হয়। কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণিদের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত যৌন প্রজনন ঘটিয়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বংশধর উদ্ভাবন করা হয়। এদের মধ্য থেকে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বেছে নিয়ে সুপ্রজনের মাধ্যমে প্রত্যাশিত উদ্ভিদ ও প্রাণি সৃষ্টি করা হয়। আধুনিক কৃষিক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উদ্ভিদের কৃত্রিম যৌন প্রজনন

যৌন প্রজননের মাধ্যমে পুংগ্যামেট ও স্ত্রীগ্যামেটের মিলনে জাইগোট সৃষ্টি হয়। এ জাইগোট থেকে সৃষ্ট বীজ হতে

উৎপন্ন গাছে কিছু প্রকরণ দেখা দেয়। উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ পরাগরেণু ও ডিম্বক উৎপন্নকারী পিতৃ-মাতৃ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ করে একই জাতের নতুন ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে পারেন। নতুন উৎপাদিত উদ্ভিদগুলি থেকে আবার পরীক্ষা করে উৎকৃষ্ঠ বৈশিষ্ট্যযুক্ত আলাদা করা যেতে পারে। নির্বাচিত নতুন উদ্ভিদগুলি উচ্চ ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম এবং প্রতিকূল পরিবেশে জন্মাতে সক্ষম হতে পারে। এমনিভাবে কোনো একটি কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ পাওয়া গেলে, সেটাকে জনন ঘটিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়।

উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল : এক্ষেত্রে প্রথমে পরিপক্ক হবার আগে একটি উভলিঙ্গ ফুলের পরাগধানীগুলিকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। এরপর ফুলটিকে পলিব্যাগ দিয়ে মুড়ে পলিব্যাগের মুখ বেধে রাখা হয়। এ ফুলটি নিষেকের জন্য মাতৃ উদ্ভিদ হিসেবে কাজ করে।

এরপর নির্দিষ্ট উদ্ভিদের ফুলের পরাগধানী থেকে তুলির সাহায্যে পরাগরেণু নিয়ে মাতৃ উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুন্ডে স্থানান্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে পলিব্যাগটি সতর্কতার সাথে খুলতে হবে এবং পরাগায়ন শেষে পুনরায় ফুলটি পলিব্যাগ দিয়ে মুড়ে রাখতে হবে।

পরাগরেণুর পুংগ্যামেট ও ডিম্বকের ডিম্বাণুর মিলন তথা নিষেকের ফলে পরিশেষে বীজ উৎপন্ন হবে। এসব বীজ থেকে গাছ জন্মিয়ে তার মধ্য থেকে আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছগুলি নির্বাচন করতে হবে। কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ পাওয়া গেলে ঐ উদ্ভিদের বীজ ব্যবহার করে নতুন উদ্ভিদ জন্মানো হয়। উৎপাদিত উদ্ভিদের বীজ পরপর ব্যবহার করতে থাকলে অনেক সময় উদ্ভিদের ভালো বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে যায়। উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ এজন্য উদ্ভিদের ভালো বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে, নতুন নতুন উদ্ভিদের প্রজনন ঘটিয়ে নতুন জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন।

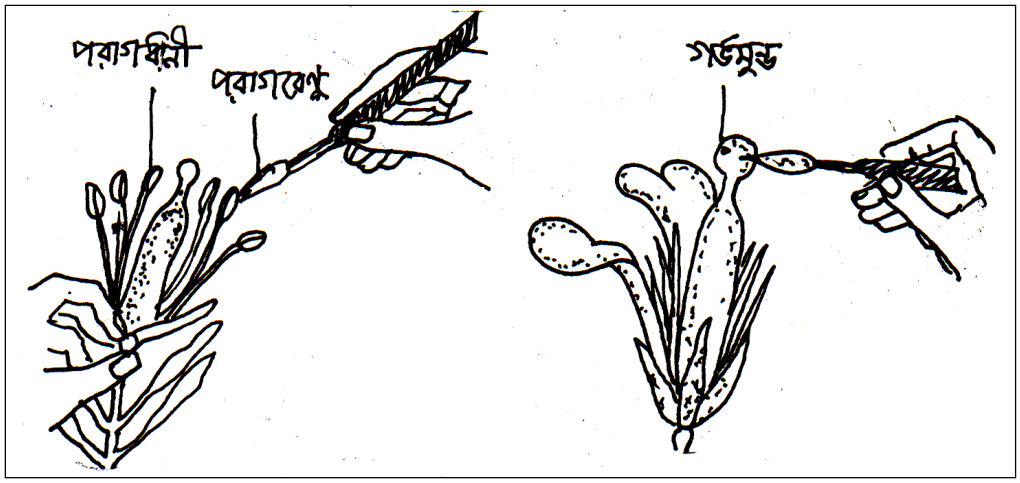

চিত্র ১৬.৪-৪ : কৃত্রিম যৌন প্রজনন বা সুপ্রজনন।

অপুংজনি (Parthenogenesis) : সাধারণত দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামেটের যৌন মিলনের মাধ্যমে যৌন প্রজনন ঘটে থাকে। কিন্তু অনেক সময় কোনো কোনো উদ্ভিদ যৌন মিলন ছাড়া তথা নিষেক ছাড়াই কোনো একটি গ্যামেট বিশেষ করে ডিম্বাণু ভ্রূণ গঠন করে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়।

নিষেক ছাড়াই একটি গ্যামেট হতে ভ্রূণ সৃষ্টি তথা নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে অপুংজনি বা পার্থেনোজেনেসিস বলা হয়। মিউকর, স্পাইরোগাইরা, কলা প্রভৃতি উদ্ভিদে এটা দেখা যায়।

সারসংক্ষেপ

- এককোষী রেণু তথা স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়াকে অযৌন জনন বলে।
- পুং গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেটের মিলনের ফলে সংঘটিত জননকেই যৌন জনন বলা হয়।
- নিষেক ছাড়াই একটি গ্যামেট হতে ভ্রূণ সৃষ্টি তথা নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে অপুংজনি বা

পার্থেনোজেনেসিস বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো উদ্ভিদ অযৌন জনন ঘটায়?
ক. ধান খ. শৈবাল গ. আম ঘ. লিচু

২. প্রোথ্যালাস কোনো উদ্ভিদে সৃষ্টি হয়?
ক. শৈবাল খ. ছত্রাক গ. মস ঘ. ফার্ণ

৩. উগোনিয়াম কোনো উদ্ভিদে সৃষ্টি হয়?
ক. ছত্রাক খ. মস গ. ফার্ণ ঘ. লিচু

৪. মেন্ডেল নিচের কোনো উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করেন?
ক. মুসুরী খ. খেসাড়ী গ. মটর ঘ. মুগ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. বীজ কাকে বলে? একটি আদর্শ বীজের অংশগুলো উল্লেখ করুন।
২. অঙ্কুরোদগমের সংজ্ঞা লিখুন। ইহা কত প্রকার ও কি কি উল্লেখ করুন।
৩. অঙ্কুরোদগম শর্তগুলি পরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করুন।
৪. অঙ্কুরোদগমের না হবার কারণগুলি উল্লেখ করুন।
৫. উদ্ভিদ জনন কাকে বলে? এর প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
৬. অঙ্গজ জনন কাকে বলে? বর্ণনা করুন।
৭. পরাগায়নের সংজ্ঞা লিখুন। পরাগায়ন কত প্রকার উল্লেখ করুন।
৮. নিষেক প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৯. ফল ও বীজের বিস্তরণ বর্ণনা করুন।
১০. পর-পরাগায়নের মাধ্যমগুলি উল্লেখ করুন।
১১. অযৌন জনন কাকে বলে? উদ্ভিদে অযৌন জনন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
১২. যৌন জনন প্রক্রিয়া কাকে বলে? উদ্ভিদে যৌন জনন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
১৩. মেন্ডেল মটর গাছের খাটো ও লম্বা উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তার জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ ব্যাখ্যা করুন।
১৪. কৃত্রিম যৌন প্রজনন কৌশল বর্ণনা করুন।
১৫. অপুংজনি বলতে কি বোঝেন? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ : ১. গ ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ : ১. খ ২. ঘ ৩. ক ৪. গ ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ : ১. খ ২. ঘ ৩. ক ৪. গ ৫. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ : ১. খ ২. ঘ ৩. ক ৪. গ।